স্রষ্টা এবং ধর্ম প্রসঙ্গ যখন অসঙ্গতির

সৈকত চৌধুরী

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ ধর্মবিশ্বাসকে ধারণ করে আসছে। তবে প্রথম দিকে তা ছিল অসংগঠিত; কিছু বিচ্ছিন্ন বিষয়ে বিশ্বাস ও তার আরাধনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কালক্রমে ধর্ম সংগঠিত হতে শুরু করে এবং জটিল আকার ধারণ করে। আধুনিক যুগে পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম দেখা যায়। যেমন- ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ, ইহুদি, বাহাই ইত্যাদি। আবার বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যার একটা বড় অংশই ধর্মহীন।

ধর্মীয় বিশ্বাস বনাম যুক্তি

ধর্মগুলোর প্রধান শর্ত ও একমাত্র অবলম্বন 'বিশ্বাস'। ধর্মগুলোকে কখনো যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হয় না, যদিও প্রত্যেক ধর্ম নিজ নিজ ধর্মের অনুকূলে অনেক যুক্তির অবতারণা করে; তবে তা কখনও যথার্থ যুক্তি হয়ে ওঠেনি। ধর্মগুলোকে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায় না বলেই হয়ত তা ধর্ম, নইলে তা পরিণত হত বিজ্ঞানে। প্রতিটি ধর্মের ভিত্তি হল বিশ্বাস, যুক্তি নয়। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কেউ কেউ যুক্তির আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু তা ধর্মের কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। তবে যুক্তির সাথে বিশ্বাসের সম্পর্ক ঠিক যেন পরস্পর বিপরীতমুখী; কেননা বিশ্বাসের প্রশ্ন তখনই আসে যখন তার সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে এবং যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ সম্ভব হয় না। যা যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদন সম্ভব, তাকে বিশ্বাস করার জন্য কেউ বলবে না। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বিজ্ঞানের কথা বলা যায়। বিজ্ঞান যুক্তি নির্ভর, তাই বিজ্ঞানের কোনো বিষয় বিশ্বাস করার জন্য কাউকে আহ্বান জানানো হয় না, যেমনটি ধর্ম করে সব সময়। বিশ্বাসের জন্য অপেক্ষা করতে পারে কেবল মিথ্যাই। আর সত্য সবসময়ই সত্য। বিশ্বাসের জন্য নেই তার অপেক্ষা। ধর্মগুলোর বিষয়ে আরেকটি কথা না বললেই নয়। কোন নির্দিষ্ট ধর্মের সকল মানুষ যদি ঠিক এ মুহূর্তে ঐ ধর্মকে অবিশ্বাস করে তবে, তাৎক্ষণিক তার বিলুপ্তি ঘটবে। তাহলে ধর্মগুলো কি শুধুমাত্র মানুষের বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল নয়? একমাত্র মানুষের বিশ্বাস ব্যতীত ধর্মের আলাদা কি কোনো অস্তিত্ব আছে?

স্রষ্টায় বিশ্বাস

স্রষ্টায় বিশ্বাস ধর্মগুলোর প্রধান ভিত্তি। তবে স্রষ্টা বিষয়টি একেক ধর্মে একেক রকম। তাঁর বৈশিষ্ট্যে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য, এমনকি নামেও। হিন্দুরা স্রষ্টাকে বলেন ঈশ্বর কিংবা ভগবান, মুসলমানরা আল্লাহ, খ্রিস্টানরা গড, ইহুদিরা জেহোভা। বিশ্বাসীরা স্রষ্টাকে বলেন আদিকারণ (first cause)। তারা বলেন সব ঘটনার পেছনে যেহেতু কারণ আছে তাই এ মহাবিশ্ব এবং এর যাবতীয় ঘটনার পেছনে এমন একটি বিশেষ কারণ থাকতে হবে যার আর নিজের কোন কারণ নেই (Uncaused cause)। আর এই বিশেষ কারণকেই তারা অভিহিত

করেছেন ঈশ্বর হিসেবে। বিষয়টি নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। প্রথমেই মনে করি, আমরা স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানি না, আর এই বিশ্বজগৎ ছাড়াও আর কোন বিশ্বজগতের সাথে পরিচিত নই। আমাদের যাবতীয় ব্যাখ্যা বিবৃতি- সব কিছুই আমাদের দেখা শোনা এবং অভিজ্ঞতার ফসল। আর অনেক ক্ষেত্রেই পূর্বসংস্কার যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দেয়। এখন সমস্যাটির গোঁড়ায় নজর দেয়া যাক। আমরা আমাদের প্রাত্যহিক ঘটনার দিকে নজর দিলে দেখতে পাই, সব কিছুর পেছনে একটা কারণ আছে। কারণ ছাড়া কিছুই হয় না। আবার সেই কারণের পেছনেও একটা কারণ আছে। এখন, আমরা আমাদের চিন্তার উৎস হিসেবে এ কথাটিকে নিতে পারি, 'সবকিছুর পেছনে একটা কারণ আছে'। এবার আমরা, কারণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধরে নিতে পারি - 'সব কিছুর পেছনে একজন ঈশ্বর আছেন, তিনি সবকিছুর কারণ, তার আর কোনো কারণ নেই'। এবার আবার আমাদের চিন্তার উৎসের দিকে নজর দেয়া যাক- প্রথমেই আমরা ধরে নিয়েছি - 'সব কিছুর পেছনে একটি কারণ আছে' কিন্তু পরে আবার নিজেরাই বলছি - -'ঈশ্বরের পেছনে কোনো কারণ নেই' । এই দুটি সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক ও বিপরীতমুখী। আমরা যেহেতু প্রথমেই স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নিয়েছি - 'সবকিছুর পেছনে একটি কারণ আছে' তাই ঈশ্বরের পেছনে কোনো কারণ থাকবে না তা হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) বলেন, "If everything must have cause, then God must have a cause"। আমরা সহজ ভাষায় বলতে পারি, সবকিছুর পেছনে যদি একজন স্রষ্টা থাকতেই হয় তবে তিনি আল্লাহ বা ঈশ্বর যাই হোন না কেন, তার পেছনেও একজন স্রষ্টা থাকতেই হবে।

আদি কারণের বিষয়ে আরো কিছু কথা বলা যায়। বিশ্বাসীরা আসলে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলতে চান - 'ঈশ্বর ছাড়া সব কিছুর পেছনেই কারণ আছে'। কিভাবে বুঝব যে এটি স্বতঃসিদ্ধ? কথা হচ্ছে ঈশ্বরকে আমরা দেখিনি। আমরা চোখের সামনে যা দেখছি তা হল- আমাদের চারপাশের বিশ্বজগত। কারণ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব যখন বিশ্বাসীরা স্বীকার করে নিয়েছেনই, তখন 'ঈশ্বর' পর্যন্ত যাওয়া কেন, বিশ্বজগতে এসেই বা আমরা থেমে যাই না কেন? এ দাবীটি আমাদের সামনে উত্থাপন করেছিলেন ডেভিড হিউম ১৯৪৭ সালে তার Dialogues Concerning Natural Religion রচনায়[1]:

> 'But if we stop, and go no farther, why go so far? Why not stop at the material world? ... By supposing it to contain the principle of its order within itself, we really assert it to be god; and the sooner we arrive at that Divine Being, so much the better. When you go one step beyond the mundane system, you only excite an inquisitive humor, which it is impossible ever to satisfy'.

ডেভিড হিউম যখন এ কথাগুলো বলেছিলেন, তখনো আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ফলাফলগুলো জানা যায় নি। আজ যখন আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ফলাফলগুলো আমাদের চোখের সামনে আসতে শুরু করেছি, তখন দেখছি আধুনিক বিজ্ঞানের বহু তত্ত্বেই শুন্য থেকে মহাবিশ্ব উৎপত্তির কথা বলা হচ্ছে। পাঠকেরা এ সংক্রান্ত বিষয়ে ধারনা লাভ করতে চাইলে অভিজিৎ রায়ের 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের

[1] David Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith (Indianapolis: Bobbs-Merril, 1947), pp. 161-62.

যাত্রী' বইটি[2] পড়ে দেখতে পারেন। এ বইয়ের শেষ অধ্যায়ে অভিজিৎ কোয়াণ্টাম দোদুল্যমানতা (quantum fluctuation) প্রক্রিয়ায় কিভাবে জড় কণিকা তৈরি হয়, তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তাঁর 'ব্রীফ হিস্ট্রি অব টাইম' গ্রন্থে স্ফীতিতত্ত্বের জনক এলেন গুথের উদ্ধৃতি দিয়ে মহাবিশ্বকে 'আল্টিমেট ফ্রি লাঞ্চ' বলে অভিহিত করেছেন। হিউম যে কথাটা অনেক আগে বলেছিলেন, আধুনিক কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা সেটিই আমাদের সামন তুলে ধরেছে - কোয়াণ্টাম দোদুল্যমানতা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভাবেই শুন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে পারলে ঈশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার দরকার কি?

আদিকারণের বিষয়ে আরো কিছু সমস্যা আছে। ধার্মিকদের আদিকারণ যে এক ও অদ্বিতীয় তার যুক্তি কী? এমনও কি হতে পারে না, আসলে আদিকারণ একটি নয় একাধিক। এ প্রসঙ্গে ইসলামের একমাত্র ও স্পষ্ট বক্তব্য হল, 'আসমান ও জমীনে যদি আল্লাহ ব্যতীত একাধিক ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।' (সূরা আম্বিয়া-২২)

এবার আমরা যদি মানুষের দিকে তাকাই, তবে দেখতে পাই একাধিক মানুষ মিলে সাধারনত একজন থেকে অধিকতর ভাল ও সুন্দর কিছু তৈরি করতে পারে। বর্তমান যুগে অনেক কিছুই বহু মালিকানাধীন, যা নিয়ে দ্বন্ধ খুব কমই হয়। তাহলে স্রষ্টার ব্যাপারে তার ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? একজনের বেশি হলেই তারা কেন মধ্যযুগীয় রাজার মত একজনের ওপর আরেকজন প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করবেন অথবা পরস্পর পরস্পরের সৃষ্টি ধ্বংসে মেতে উঠবেন, তা বোধগম্য নয়। এছাড়া তারা একেকজন যদি নিজের মত করে একেকটি মহাবিশ্ব বা মাল্টিভার্স সৃষ্টি করেন তাতেই বা বাধা কে দিবে? আবার তারা সকলে মিলে সবার মতানুসারে একটি মহাবিশ্ব তৈরি করলেই বা সমস্যা কোথায়? এছাড়া তাদেরকে যে একটা কিছু তৈরি করতেই হবে এমনও তো নয়। এই মহাবিশ্ব তৈরির আগে ঈশ্বর কিছু না করেই যেমন অলস সময় কাটাচ্ছিলেন তেমনি ভাবেই কাটিয়ে দিতে পারতেন অনন্ত সময়। তাই একত্ববাদের যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য তাও ভেবে দেখতে হবে। ইবনে ওয়ারাক তাঁর 'Why I am Not a Muslim' গ্রন্থে হাল্কা রসিকতা করে বলেন, পলিথিইজম থেকে মনোথিজমে আসতে যেমন বহু 'গড'কে ছেঁটে ফেলা হয়েছে, তেমনি কালের পরিক্রমায় মনোথিইজম থেকে এথিজমে উত্তোরণের জন্য বাকী একটি 'গড'কেও ভবিষ্যতে ছেঁটে ফেলা হবে।

উদ্দেশ্যবাদীরা বলে থাকেন, স্রষ্টা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টার মানুষ তৈরির উদ্দেশ্য একেক ধর্মে একেক রকম। যেমন- ইসলাম ধর্মমতে,

'জিন ও মানুষ জাতিকে আমি কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি' (৫১: ৫৬)।

এখানে প্রশ্ন এসে যায়, স্রষ্টার তো কোন অভাববোধ থাকতে পারে না এবং ইবাদতেরও তার কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে কেন মানুষকে ইবাদত বা উপাসনা করার জন্য সৃষ্টি করলেন। বর্তমানে লব্ধ জ্ঞানে আমরা জানি মহাবিশ্বের তুলনায় আমাদের পৃথিবী একটি বিন্দুসম। আর এই পৃথিবীতে যে মানুষগুলো আছে তা

[2] অভিজিৎ রায়, 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' অংকুর প্রকাশনী, ২০০৫

নিশ্চয়ই স্রষ্টার জন্য বড় একটা ব্যাপার হতে পারে না। আধুনিক যুগের পূর্বে সামান্য কিছু মানুষ ব্যতীত সকল মানুষই ছিল নিরক্ষর। আধুনিক যুগেও এসে মানুষকে সে অবস্থা থেকে পরিত্রাণ করা যাচ্ছে না। সেই মানুষগুলোকে স্রষ্টা কেনই বা এত উচ্চাশার সাথে তৈরি করলেন।

মানুষের চেয়ে উন্নততর কোনো প্রাণী নেই বিধায় আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা আঁচ করতে না পেরে নিজেদেরকে অত্যন্ত জ্ঞানী ও ক্ষমতাবান মনে করতে থাকি। তাই হয়ত কল্পনা করি যে, অসীম জ্ঞানী স্রষ্টা আমাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হবেন না কেন।

এখানে আরেকটি কথা এসে যায়, ধর্মগ্রন্থসমূহ মতে যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য কি পূরণ হয়েছে? আমরা ইসলামের ইতিহাসে দেখতে পাই কখনো মুসলমানদের সংখ্যা অমুসলিমদের চেয়ে বেশি হয় নাই। এছাড়া মানুষ সাধারণত ধর্মের দৃষ্টিতে যতটা না সৎকাজ করে তার তুলনায় পাপাচার হচ্ছে ঢের বেশি। আর দুর্ভিক্ষ, খরা, বন্যা, ভূমিকম্প কিংবা সুনামীতে হাজারে হাজার নারী, পুরুষ আর নিরপরাধ শিশু মারা যাচ্ছে। এবার কেউ হয়ত বলতে পারেন স্রষ্টা আমাদেরকে পৃথিবীতে পরীক্ষা করছেন। তাহলে বলব, পরীক্ষার ফল কি হল? তিনি কেন তুচ্ছ মানুষদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। এটা কি তার পবিত্রতার বরখেলাপ নয়? যেহেতু সকল ধর্ম মতেই স্রষ্টা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাই আপত্তিটি কিছুটা পরিবর্তিত রূপে সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই উত্থাপন করা যায়।

অনেকে আবার স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য মহাবিশ্বের শৃঙখলার দোহাই দেন। এ বিষয়ে নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিফেন ওয়াইনবার্গ বলেন, ‘যে বিশ্ব একেবারে বিশৃঙ্খল, বিধিবিহীন, তেমন একটি বিশ্বকে কোনো মূর্খের সৃষ্ট বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।’

অনেকে এমনও বলেন, স্রষ্টাকে আপনি বুঝবেন না। স্রষ্টাকে যদি নাইবা বুঝি তবে তাকে বিশ্বাস করব কিভাবে? যেখানে একেক ধর্মে একেক ধরনের স্রষ্টা; এছাড়া তার অস্তিত্বের বিরোধিতা অনেকেই করেছেন। আর আমরা স্রষ্টাকে না বুঝলে তিনি যে উদ্দেশ্যে আমাদের সৃষ্টি করেছেন বলা হয়, তা পূর্ণ হবেই বা কিভাবে? অবশ্য স্রষ্টা বিষয়টি মানুষের যদি অবোধগম্য হয়, তবে তা নিয়ে মাথাব্যথার কোন কারণ নেই। কেননা তাহলে তিনি অবশ্যই মানুষকে তাঁর আরাধনা বা স্তুতির জন্য নয়, অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। এটি অতিবর্তী ঈশ্বরবাদীদের(Deist) বিশ্বাস। যদিও ‘ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন’ ঈশ্বরের পেছনে জোরালো কোনো যুক্তি নেই, তবে তা আমাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে তেমন কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলে না, বিধায় তা মন্দ হয়ত বলা যায় না। আরেকটি কথা, আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি স্রষ্টাই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমরা বেমালুম ভুলে যাই যে, আমরা নর ও নারীর (পিতা-মাতা) মাধ্যমে জৈবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের জন্ম সম্পূণই তাদের (পিতা-মাতা) ইচ্ছা কিংবা সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল ছিল।

বিভিন্ন ধর্মমতে স্রষ্টার বিভিন্ন গুণ রয়েছে। যেমন- তিনি খুশি হন, রাগ করেন, দেখেন, শোনেন, বুঝেন। বলা হয় তিনি নিরাকার। আবার তাঁর নূর বা জ্যোতি রয়েছে! এছাড়া স্রষ্টার দুটি গুণ অসীম দয়ালু ও

ন্যায়বিচারক পরস্পরবিরোধী। যিনি ন্যায়বিচারক, তিনি দয়ালু হন কিভাবে আর যিনি দয়ালু, তিনি ন্যায়বিচারক হন কিভাবে? এছাড়া তার বসবার জন্য রয়েছে সিংহাসন (আরশ); স্রষ্টাকে বলা হয় অসীম আবার তাকে কেন্দ্রীভূত করা হয় নির্দিষ্ট একটি জায়গায়। স্রষ্টাকে বলা হয় তিনি অসীম ক্ষমতাবান। তাহলে তিনি কি এমন কিছু তৈরি করতে পারবেন যা তিনি নিয়ন্ত্রণে অক্ষম। প্রশ্নটির উত্তর হ্যা বা না যেটিই হোক তা তার অক্ষমতা প্রকাশ করবে। অর্থাৎ অসীম ক্ষমতাবান বা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলতে কিছু নেই। এছাড়া স্রষ্টা বিষয়ে আরেকটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ, স্রষ্টার কি এমন কোন গুণ রয়েছে যা সীমিতভাবে মানুষের মধ্যে নেই? তা তো থাকার কথা ছিল, কিন্তু নেই। এতে বিষয়টি পরিস্কার যে, মানুষের পক্ষে স্রষ্টার ও তার গুণাবলির কল্পনা সম্ভব এবং মানুষ তা-ই করেছে।

বিভিন্ন ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্যান্য কিছু প্রসঙ্গ

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম মতে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বর্গ, পৃথিবী, জীবজগৎ ও বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং তারপর তিনি আদম (অ্যাডাম) ও হাওয়া (ইভ) নামক প্রথম মানব-মানবীকে মাটি থেকে তৈরি করে প্রাণ দেন। সৃষ্টিমূহুর্তে পৃথিবী ছিল আকারহীন ও শূণ্য এবং মহা অন্ধকারে নিমজ্জিত। বিশ্ব মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে ধ্বংস হবে আর ঐ দিনই ঈশ্বর সকলের কৃতকর্মের বিচার করবেন।

বাইবেল গ্রন্থটি স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। শ্রদ্ধেয় ডাঃ ওয়াহিদ রেজা তাঁর 'ধর্মচেতনা ও ঈশ্বরবিশ্বাস' (এ বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে সংকলিত) প্রবন্ধে মানুষ সম্পর্কিত বাইবেলের ৬টি স্ববিরোধী উক্তি উল্লেখ করেছেন :

> ১। মানুষ সৃষ্টি হওয়ার আগে গাছ এলো (জেনেসিস ১: ১১-১২) মানুষ তৈরি হওয়ার পর গাছ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ১: ৭-৯)।
> ২। জন্তু জানোয়ারদের পরে মানুষ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ১: ২৫-২৬) জন্তু জানোয়ারদের আগে মানুষ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ২: ১৮-২০)
> ৩। আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার দিনই মরবে (জেনেসিস ২: ১৭) আদম ৯৩০ বছর বেঁচেছিল (জেনেসিস ৫: ৫)
> ৪। ঈশ্বর মানুষকে লোভ দেখান না (জেমস ১: ১৩) ঈশ্বর মানুষকে লোভ দেখান (জেনেসিস ২২ : ১/২ স্যামুয়েল ২৪ :১)
> ৫। কোন মানুষ ঈশ্বরকে দেখেনি বা দেখতে পারে না (জন ১ : ১৮/১ টিম ৬ : ১৬) অনেকের কাছেই তিনি দেখা দিয়েছেন (জেনেসিস ২৬ : ২/ এক্সোডাস ২৪ : ৯-১০, ৩৩ : ২২-২৩)
> ৬। কেউই ঈশ্বরের মুখদর্শন করার পর বেঁচে থাকতে পারে না (এক্সোডাস ৩৩ : ২০) জেকব ও মুসা দুজনেই ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখেছেন কিন্তু মরেন নি (জেনেসিস ৩২: ৩০, এক্সোডাস ৩৩ : ১১)

বাইবেল ও কোরানের মতে পৃথিবী স্থির। বাইবেলের এই ধারণার কারণে সৌরকেন্দ্রিক মতবাদের জন্য ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছিল খ্রিস্টান ধর্মপুরুষরা, গ্যালিলিওকে করেছিলো গৃহবন্দি। এবার কোরানে আসা যাক। কোরানের ভাষায়[3]-

[3] বঙ্গানুবাদ কোরান শরীফ মাও. ফজলুর রহমান মুন্সি।

'নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়।' (৩৫:৪১, তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন)
'ইহা তার নিদর্শনসমূহ-আসমান জমিন তারই হুকুমে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে।' (৩০:২৫)

সৃষ্টিসম্পর্কে কোরানের অন্যত্র বলা হয়েছে,

'আর তিনি এমন যে, সমস্ত আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তখন আরশ[4] ছিল পানির উপরে।' (১১:৭)

'আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি হতে সৃষ্টি করেছেন' (২৪:৪৫) আবার কিয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সেদিন আটজন ফেরেশতা রবের আরশ বহন করবেন' (৬৯:১৭)

সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াত মতে, মৃত ব্যক্তির মা, বাবা, দুই মেয়ে ও এক স্ত্রী থাকলে তার সম্পত্তির মা পাবে ১/৬, বাবা ১/৬, দুই মেয়ে ২/৩ ও স্ত্রী ১/৮ অংশ। তাহলে মোট অংশ দাঁড়ায় (১/৬+১/৬+২/৩+১/৮) = ২৭/২৪ অংশ, যা মূল পরিমাণের চেয়ে বেশি। পরে হজরত আলী তা সংশোধন করেন, যা ফরায়েজে আইনে 'আউল' নামে পরিচিত।

সূরা ফাতেহা (বিশেষত আয়াত চার থেকে সাত) আল্লাহর বাণী হয় কিভাবে? পুরো সূরাটি পড়লে সুরাটিকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা বলেই মনে হয়। সেখানে আল্লাহর কাছে সঠিক পথ দেখানোর আহবান জানানো হয়েছে। ইবনে ওয়ারাক তার 'Why I am Not a Muslim' গ্রন্থে এ নিয়ে বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। আমি সুরা ফাতেহা সম্পর্কে ইবনে ওয়ারাকের বই থেকে একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি[5] -

'These words are clearly addressed to God, in the form of prayer. They are Muhammad's words of praise to God, asking God's help and guidance'

এছাড়া সূরা তওবা স্বতন্ত্র সূরা নাকি অন্য কোন সূরার বা সূরা আনফালের অংশ তা নিয়ে বিভেদ আছে। সূরা ফীল ও কোরাইশ এক সূরা নাকি পৃথক দুটি সূরা তা নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল। তাছাড়া কোরানের আয়াত, শব্দ, বর্ণ, সংখ্যা নিয়ে বিভেদ রয়েছে, তা অনেকেই খেয়াল করেন না।

এবার আসি হাদিসে। আবু যর গেফারি (রা.) একদিন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে সূর্যাস্তের সময় মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন আবু যর, সূর্য কোথায় অস্ত যায় জানো? আবু যর বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নিচে পৌঁছে সেজদা করে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকেও এই সম্বন্ধে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যহ সূর্য আরশের নিচে পৌঁছে সেজদা এবং নতুন পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিভ্রমণ শুরু করে[6]।

[4] আরশ শব্দের অর্থ রাজসিংহাসন; আল্লাহর আসন।

[5] Ibn Warraq, Why I Am Not a Muslim, Prometheus Books, 1995

[6] সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৪/৫৪/৪২১ দ্রঃ; তফসীর মাআরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১১৩৩

এখন প্রশ্ন হল পৃথিবীর এক জায়গায় সূর্যাস্ত হলে অন্য জায়গায় থাকবে দুপুর, আরেক জায়গায় থাকবে সূর্যোদয়। তাহলে যা বলা হল, তার ব্যাখ্যা কী?

বিশ্বসৃষ্টির আদিতে যে অবস্থা বিরাজ করছিল, হিন্দুধর্মের মনুসংহিতার ঋষি তা বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'এই যে বিশ্বসংসার চোখের সামনে প্রত্যক্ষ তা ছিল গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই অন্ধকার জগ ছিল আমাদের জ্ঞানের অতীত, কোনো লক্ষণের সাহায্যে এ সম্পর্কে অনুমানের কোনো উপায় ছিল না। এই জগ ছিল অজ্ঞেয়, যেন সর্বতোভাবে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এই প্রলয়াবস্থার পর স্বয়ম্ভূ সূক্ষরূপী ভগবান পঞ্চমহাভূত প্রভৃতিতে ব্যক্ত করলেন- তিনি অমিততেজা, প্রলয়াবস্থার বিনাশক রূপেই যেন আবির্ভূত হলেন।' (মনুসংহিতা ১: ৬-৭)

সৃষ্টির আদিতে কী ছিল তা ঐতিরেয় উপনিষদে' বিবৃত হয়েছে- 'সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল; নিমেষাদি ক্রিয়াশীল অন্য কিছুই ছিল না। সেই আত্মা এই রূপ ঈক্ষন করিলেন- "আমি লোকসমূহ সৃজন করিব"।' (১:১:১)

বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতে, 'পূর্বে কিছুই ছিল না, এই জগ ভোজনেচ্ছারূপ মৃত্যু দ্বারা আবৃত ছিল, কারণ বুভুক্ষাই মৃত্যু। 'আমি সমনস্ক হইব'- এইরূপ উদ্দেশ্যযুক্ত হইয়া ঐ মৃত্যু কার্যপর্যালোচনক্ষম মনের সৃষ্টি করলেন। তিনি আপনাকে পূজা করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন অর্চনারত ছিলেন, তখন উদক (জল) উৎপন্ন হইল।' (১:২:১) 'জলই অর্ক। উক্ত স্থলে জলের উপরে সরের ন্যায় যাহা হইয়াছিল, উহা গাঢ় হইল; এবং উহা পৃথিবীতে পরিণত হইল। পৃথিবী সৃষ্টি হইলে শ্রান্ত ক্লান্ত সেই মৃত্যু থেকে তেজোরস নির্গত হইল; (ইনিই) অগ্নি অর্থাৎ বিরাট।' (১:২:২)

এ বর্ণনা থেকে এটাই উপলব্ধি হয় যে, হিন্দুধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে বিজ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নেই এবং তা আদিম কল্পনা বৈ কিছু নয়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, যুক্তির সাথে বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব প্রকট এবং বিরাট। যুক্তির ওপর ভর করে বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে। আর বিশ্বাসের ওপর ভর করে ধর্মগ্রন্থগুলো। এখন আপনি কোনটি গ্রহণ করবেন?

আমরা এ কথা স্পষ্টভাবে মনে করি- ধারণ করি, আমাদেরকে অবশ্যই ধর্মগ্রন্থগুলো পড়তে হবে, যার যার নিজের ভাষায়, যুক্তি প্রয়োগ করে বুঝতে হবে ধর্মগ্রন্থে বাণীসমূহের মর্মার্থ। শুধু পুণ্যলাভের আশায় পবিত্র ভাষায় না বুঝে, পাঠ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। না বুঝে পাঠ করলে শুধুই অজ্ঞতাই বৃদ্ধি পায়, জ্ঞান বাড়ে না। আর এই অজ্ঞতা নামক দুর্বলতার সুবিধা নেয় আমাদের চারপাশের কিছু ভণ্ড মোল্লা-মৌলভি, পির-ফকির, ঠাকুর প্রমুখেরা। তাই আমাদের সমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল করে তুলতে হলে, আসুন আমরা যুক্তির আশ্রয় নেই। ঝেড়ে ফেলি সকল অজ্ঞতা, কুসংস্কার আর পবিত্র বিশ্বাসের নামে অপবিশ্বাসগুলো। এর কোনো বিকল্প নেই।

সৈকত চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল-এর সদস্য। যুক্তি পত্রিকাটিতে নিয়মিতভাবে তার লেখা প্রকাশিত হয়।